KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 200	Place of Publication : 28/2 আর. এন. দাস রোড, কল-৩১
Collection : KLMLGK	Publisher : তুলসী মুখোপাধ্যায়
Title : অনুভব (ANUBHAB)	Size : 8.5"/5.5"
Vol & Number : গ্রীষ্ম সংকলন শারদ সংকলন Puja Special শারদ সংকলন (Autumn) শারদ সংকলন (Autumn)	Year of Publication : May 1981 1981 1984 1987 Condition : Brittle Good ✓
Editor : তুলসী মুখোপাধ্যায়	Remarks

C.D. Roll No. KLMLGK

তুলসী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

অন্বিষ্ট

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

কবিতা পত্র

শারদ সংকলন ১৩৯১

অনুবাদ কবিতা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ : অমিতাভ চৌধুরী

কবিতা :

হরপ্রসাদ মিত্র নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত অরুণ ভট্টাচার্য কৃষ্ণ ধর কবিতা সিংহ সুনীল বসু সুনীলকুমার নন্দী শক্তি চট্টোপাধ্যায় আনন্দ বাগচী পূর্ণেন্দু পত্রী গৌরাঙ্গ ভৌমিক অমিতাভ দাশগুপ্ত অজিত মৈত্র রত্নেশ্বর হাজরা সামসুল হক মঞ্জুভাষ মিত্র উত্তম দাশ বাদল ভট্টাচার্য নারায়ণ মুখোপাধ্যায় অর্ধেন্দু চক্রবর্তী মৃত্যুঞ্জয় সেন নীরদ ভট্টাচার্য নির্মল বসাক জ্যোতিরীশ চক্রবর্তী কৃষ্ণসাধন নন্দী বরুণ মণ্ডল সুদীপ চক্রবর্তী বিজন দত্ত গৌতম গুহ আনন্দ ঘোষ হাজরা মৃণাল বসু চৌধুরী শিশির গুহ সুদীপ্ত রায় মুকুল গুহ অজিত বাইরী মনোজ নন্দী শ্যামলকৃষ্ণ বসু রাখালরাজ মুখোপাধ্যায় জয়ন্ত মুখোপাধ্যায় প্রবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত বিজয়া মুখোপাধ্যায় সুরজিৎ ঘোষ সজল বন্দ্যোপাধ্যায় জহর সেন মজুমদার তুলসী মুখোপাধ্যায়।

২০%
ছাড় ৬ই থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর
তন্তুশ্রী
তন্তুশ্রী মানে ভালো তাঁতের কাপড়।
তন্তুশ্রী মানে ভালো সিল্কের কাপড়।
তন্তুশ্রী মানে ভালো বেডশীট, বেডকভার।
বাংলার তাঁতশিল্পীদের ভালোবাসুন
আর তন্তুশ্রী র কাপড় কিনুন।
তনুশ্রী বর্ধনে তন্তুশ্রী আপনার চিরসাথী।
কলকাতা, দিল্লী, আগরতলা, বাঙ্গালোর, এবং
অন্যত্র তন্তুশ্রীর কাপড় পাওয়া যায়।
ওয়েষ্ট বেঙ্গল হ্যাণ্ডলুম এণ্ড পাওয়ারলুম
ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ
(পঃ বঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩
PB 10881

স্পোর্টসম্যান রবীন্দ্রনাথ

অমিতাভ চৌধুরী

ফুটবল ক্রিকেট না খেললে যদি স্পোর্টসম্যান হওয়া না যায়, তাহলে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই স্পোর্টসম্যান নন। তাঁর রচনায় ফুটবল-ক্রিকেটের অজস্র উল্লেখ আছে, কিন্তু এই দু'টি বিষয়ে তাঁর পারদর্শিতা বা বিশেষ আগ্রহ ছিল কিনা জানা যায় নি। তবে পারদর্শিতা থাকবেই বা কী করে। রবীন্দ্রনাথ যখন তরুণ, তখন এ দুটি খেলার চল এদেশে ছিল না। খেলার মধ্যে তো তখন হাডুডুডু ধাপসা ইত্যাদি। এগুলোতে তিনি নিশ্চয়ই পারদর্শিতা দেখাতে পারতেন, কিন্তু তার চেয়েও বড় স্পোর্টসে তিনি মেতেছিলেন ছেলেবেলায়। ফুটবল-ক্রিকেট-হকি না খেললেও কুস্তি সাঁতার ঘোড়ায় চড়া শিকার ইত্যাদি—অর্থাৎ উঁচু দরের স্পোর্টসে রবীন্দ্রনাথ যে পারদর্শী ছিলেন, তার প্রমাণ অজস্র। তাছাড়া ব্যাটবল, লাটিম ঘোরানো, ঘুড়ি ওড়ানো, মার্বেল খেলা ইত্যাদির সঙ্গেও পরিচয় ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন—"তখন খেলা ছিল সামান্য কয়েক রকমের। ছিল মার্বেল, ছিল যাকে বলে ব্যাটবল—ক্রিকেটের অত্যন্ত দূর কুটুম্ব। আর ছিল লাটিম ঘোরানো, ঘুড়ি ওড়ানো। শহরের ছেলেদের খেলা সবই ছিল কমজোরি। মাঠজোড়া ফুটবল খেলার লম্ফঝম্প তখনও ছিল সমুদ্রপারে।"

রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ বয়সের মজবুত চেহারা দেখেই আন্দাজ করা যেত, যৌবনে কত শক্তিমান ছিলেন তিনি। রথীন্দ্রনাথ পিতৃস্মৃতিতে লিখছেন, তাঁর বাবা সাঁতারে এত ওস্তাদ ছিলেন

যে, পদ্মা নদী এপার ওপার করতে পারতেন। ছিপ নৌকো নিয়ে যখন একা বেরিয়ে পড়তেন, তখন শিলাইদহ এলাকার লোকেরা বুঝতো বাবুমশায়ের কব্জির জোর কতটা। বিলিতি পরিভাষায় এই সুইমিং এবং রোয়িং-এ যেমন পাকা স্পোর্টসম্যান তিনি ছিলেন, তেমনি ছিলেন রেসলিংয়ে। ঠাকুরবাড়ির রেওয়াজ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথকে বালক বয়সেই কুস্তি লড়তে হত ভোর-বেলা। তিনি লিখছেন—"অন্ধকার থাকতেই বিছানা থেকে উঠি। কুস্তির সাজ করি। শীতের দিনে সির্‌সির্‌ করে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে থাকে। শহরে এক ডাকসাইটে পালোয়ান ছিল। কানা পালোয়ান। সে আমাদের কুস্তি লড়াত।"

ঘোড়ায় চড়ার অভ্যেস ছিল শিলাইদহতে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁকে ঘোড়সওয়ার বানিয়েছিলেন। জ্যোতিদাদার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বহুবার ঘোড়ায় বা হাতিতে চড়ে বন্দুক হাতে শিকারে গিয়েছেন। কলকাতায় গড়ের মাঠেও রবীন্দ্রনাথ ঘোড়া ছুটিয়েছেন। তাঁর জবানিতেই সেই কাহিনী শোনা যাক।—"জ্যোতিদাদা ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসতেন। বউঠাকরুনকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে যেতেন, এমন ঘটনাও সেদিন ঘটেছিল। শিলাইদহে আমাকে দিলেন এক টাট্টু ঘোড়া। সে জন্তুটা কম দৌড়বাজ ছিল না। আমাকে পাঠিয়ে দিলেন রথতলার মাঠে, ঘোড়া দৌড় করিয়ে আনতে। সেই এবড়ো খেবড়ো মাঠে পড়ি-পড়ি করতে করতে ঘোড়া ছুটিয়ে আনতুম। আমি পড়ব না, তাঁর মনে এই জোর ছিল বলেই আমি পড়িনি। কিছুকাল পরে কলকাতার রাস্তাতেও আমাকে ঘোড়ায় চড়িয়েছিলেন। সে টাট্টু নয়, বেশ মেজাজি ঘোড়া। একদিন সে আমাকে পিঠে নিয়ে দেউড়ির ভিতর দিয়ে সোজা ছুটে গিয়েছিল উঠোনে—যেখানে সে দানা খেত।" বন্দুক ছোঁড়া এবং হাতি বা ঘোড়ার পিঠে রবীন্দ্রনাথের শিকার যাত্রার

অনেক কথাও তিনি নিজেই লিখেছেন।

আরও দুটি খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে লেখা একটি চিঠিতে টেনিস খেলার কথা আছে। বোম্বাই থেকে জানাচ্ছেন—সাহেবদের সঙ্গে কয়েক সেট খেলে এইমাত্র ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন তখন। আই সি এস দাদার দৌলতে টেনিস খেলাটা অতি স্বাভাবিক ছিল। তবে কেমন খেলতেন, তার কোন সাক্ষ্য মেলে নি। ব্যাডমিন্টন যে খেলতেন, তার সাক্ষ্য মিলেছে হেমন্তবালা দেবীর স্মৃতিকথায়। তিনি জানাচ্ছেন: প্রণাম করার সময় পায়ের একটি মরানখ দেখে এই অসুন্দরের চিহ্ন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ছোটবেলায় খালি পায়ে ব্যাডমিন্টন খেলার সময় ওই নখ উপড়ে যায়।

এই তো গেল স্পোর্টসম্যান রবীন্দ্রনাথের কথা। দেখা যাচ্ছে সুইমিং রোয়িং রেসলিং হান্টিং হর্স রাইডিং টেনিস ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি সব মিলিয়ে হালের যে কোন তরুণের চেয়ে অনেক বেশি ক্রীড়াবিদ ছিলেন তিনি। কবি হলেই যে নমনীয় কমনীয় এবং ক্রীড়াজগৎ থেকে দূরে থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। ইনডোর গেমস? বৌদিদের সঙ্গে কদাচিৎ বিন্তি গ্রাবু ইত্যাদি খেলা ছাড়া তাস দাবা পাশার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। এত সময় কোথায় তাঁর? তবে তাস খেলুন আর না খেলুন, তাস নিয়ে একখানি দারুণ নাটক অন্তত লিখেছেন। হরতন রুইতন ইস্কাপন চিড়িতনকে তাসের দেশে হাজির করেছেন।

———

হরপ্রসাদ মিত্র

শেষগাড়ি

□

উড়ুক্কু হাওয়া আসবেই—ধুলো ওড়াবেই—পাতা ছড়াবেই।
ট্রেনের জান্‌লা থেকে দেখা দূর দিগন্ত
ছুটে পালাবেই।
কিন্তু তা' নিয়ে যন্ত্রণা যাই হোক্ না—
ঘ্যানর-ঘ্যানর করার যন্ত্র
এ-মিঞা তেমন লোক না।

একথাটা কহতব্য যে, ক্রমে সবি স'য়ে যায় সময়ে—
যেমন মাজাটা ভাঙ্‌তে-ভাঙ্‌তে
মাথাটাই যায় এগিয়ে—
বুকে চাপ ধ'রে হাঁটতে—
ইচ্ছে করে না নিজেই এগিয়ে মায়ার রজ্জু কাটতে।

হঠাৎ কবে যে হুড়মুড় ক'রে শেষগাড়ি এসে পড়বে—
মিথ্যে সে-চাপ জমানো বাড়ানো—মিথ্যে।
পাদানিতে তোলা, ভেতরে প্রবেশ, খুলে মেলে রাখা দরজা—
তারই দায়িত্ব তারই দায়িত্ব শেষটা।
উড়ুক্কু হাওয়া ঠেলবেই ঠিক, ঠেলবেই।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দরকার ছিল

□

কিছু আমি দেখতে চেয়েছিলুম,
কিছু আমি চাইনি।
কিন্তু যা চাইনি, তাও যে আমার দেখে নেবার
দরকার ছিল,
তাতেও আজ আর সন্দেহ করি না।

সকালবেলায়
দিগন্তের নীচ থেকে ঠেলে-দেওয়া
মস্ত একটা লাল বলের মতো
সূর্যদেব উঠে এসেছিলেন
আকাশে।

দুপুরে আর বিকেলে যখন তাঁকে দেখেছি,
জবাকুসুমসঙ্কাশং সেই মহাদ্যুতি তখন
রক্তবর্ণ পোশাক ছেড়ে
মস্ত একটা হিরের মতন
জ্বলছিলেন।

সন্ধ্যায় ফের রক্তাম্বর ধারণ করে তিনি
আকাশগঙ্গায় ডুব দিয়েছেন।
চারদিকে এখন অন্ধকার।
কিন্তু এই অন্ধকারও যে দেখে নেবার দরকার ছিল,
তাতেও আজ আর সন্দেহ করি না।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

দুশ্চিন্তা

□

সিঁড়ির নীচে কোণে কোণে অন্ধকার বাসা বাঁধে।
বাইরেও অন্ধকার, আজ অমাবস্যা, লোডশেডিং
আকাশেও নক্ষত্র নেই; মেঘের কুয়াশা সর্বত্র,
অন্ধকার যেন দূরদূরান্ত থেকে হেঁটে এসে
সিঁড়ির কোণে বাসা বাঁধে।

স্বাভাবিক পরিবেশে রাতকে ভীতিপ্রদ মনে হয় না,
দিনের পর রাত, রাতের পরিবৃত অন্ধকার
মানুষের রক্ত চলাচলের মতোই তো স্বাভাবিক ;
অন্ধকার রাতের নক্ষত্র, গাছের ছায়ামূর্তি,
কার্নিশের ওপর বসে থাকা কালো বেড়াল,
শিশুর কান্না মাতালের অট্টহাসি কুকুরের ডাক—
সব স্বাভাবিক যতোক্ষণ না দীর্ঘ অপেক্ষার
মুহূর্তগুলি দুশ্চিন্তার বৃশ্চিকগুলোকে
মনে, রক্ত চলাচলে ছড়িয়ে দেয়,
সিঁড়ির নীচে এক ঝলক অন্ধকার ঢেলে দেয়॥

আনন্দ ঘোষ হাজরার

বনস্থলী জুড়ে শব্দ হোক

কবিতা গ্রন্থটি পড়েন নি এখনো ?

যে কোনো সম্ভ্রান্ত দোকানে খোঁজ করুন

অরুণ ভট্টাচার্য

যখন আমার মন খারাপ হয়

□

এইমাত্র চলে গেল হরতনের বিবি,
আমি সকালবেলা বসে বসে বকুলফুলের মালা গেঁথেছিলাম।

এইমাত্র চলে গেল ইস্কাবনের সাহেব,
আমি সারা দুপুর ধরে নিস্তব্ধ প্রহরগুলি গুণেছিলাম।

এখন আমি গভীরতর রাত্রি জেগে
শুকতারার প্রতীক্ষায় আছি।

মাঝে মাঝে যখন আমার মন খারাপ হয়
আমি রাজা ও রাণীর চলে-যাওয়ার দৃশ্যপট ধরে রাখি।

অরুণ ভট্টাচার্যের শেষতম কাব্যগ্রন্থ

চারিদিকে খেলাঘর

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। মূল্য টাঃ ১০.০০

ছাপা চলছে "কবিতার ভাবনা" ধারাবাহিক প্রকাশক্ষণ থেকে বাংলা কবিতার জগতে যে রচনাবলী আলোড়ন তুলেছিল।

অরুণ ভট্টাচার্যের গবেষণা-গ্রন্থ

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা কবিতা এবং নানা প্রসঙ্গ

আপনার সংগ্রহে রাখুন। মূল্য টাঃ ৩০.০০

প্রাপ্তিস্থান : উত্তরসূরি ॥ ৯বি-৮ কালীচরণ ঘোষ রোড কলকাতা-৫০
উচ্চারণ ॥ ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা-৭৩

কৃষ্ণ ধর

মানুষের তুলনা

□

কতোদিন আমি শুধু একা একা খুঁজতে গিয়েছি
মানুষের ভিড়ে আমি মানুষের মুখ
প্রতিদিন মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা
মানুষের সঙ্গে চলে অন্তরঙ্গ সংলাপের ভাষা
দেখেছি জেনেছি আমি অনেক মানুষ
মানুষের সঙ্গে শুধু মানুষের তুলনা সম্ভব।

প্রকৃতির কাছে আমি গিয়েছি অনেক
অরণ্যের গন্ধ নিয়ে ঘুরেছি অনেক
বিকেলের ছায়ায় ছায়ায় খুঁজতে গিয়েছি আমি
সেই সব পাখিদের ডানা
আকাশের রহস্য যার থাকেনি অজানা
নদীর স্রোতের ভিতর খুঁজতে গিয়েছি আমি
মাছের সংসার
পৃথিবীর সব কিছু আমাকে ডেকেছে
হাতের মুঠোতে আমি পৃথিবীর মাটি ধরে আছি

মানুষের ভিড়ে আমি খুঁজেছি মানুষ
মানুষকে দেখে আমি সহোদর বলে তাকে চিনি।

কবিতা সিংহের কবিতা

দেখেছো বিবাহ

□

দেখেছো বিবাহ, রাত্রি—ভেঙ্গে গেছে পথের মতন
কখনো রাত্রিও হয়, এই ভাবে, অদ্ভুত নিশানা
কখনো অন্ধকারও বিচ্ছুরিত হয়ে যায়
আলোর গুঁড়ায়
দেখেছো বিবাহ—রাত্রি, চির বৈধব্যের দিকে
নিয়ে যাবে তোমাকে ক্রমশ
দুঃখের ভিতর দিয়ে অপমান কেটে কেটে যায়
পথ যায় পায়ে পায়ে পথ যায়
পারের ক্ষুধায়

অমল

□

তোমার নামেই কারা এখনো শিউরে ওঠে ভয়ে
তোমার নামেই কারা সংকুচিত হয়ে বুকে হাঁটে
কারা? কে? কে?
আমি সব নামগুলি বুনে রাখি কাঁটার পশমে
ফরাসী বিপ্লবে এক নারীর মতন একই ভাবে।
কেবল তফাৎ এই—গিলোটিনে দেবনা তাদের

মরুক তাহারা তারা নিজ নিজ সৃজিত নরকে।

সুনীল বসু

চালাক জহুরীরা

□

এটা বড়ো সুখের সময়
তোমার চারদিকে কত কেউ ঘিরে আছে
যেন তুমি কত শত হিতাকাঙ্খীতে ভরে আছ
কেন না এখন যে তোমার সুখের সময়
সুখের নাটকে রঙ্গমঞ্চে কত লোক, পাইক পেয়াদা,
বরকন্দাজ

তোমার দুঃখের সময় এটা, তোমার বিপদের দিন
রঙ্গমঞ্চের বহালতবিয়তরা চক্ষের পলকে
কে কোথায় ভো ভা, এক লহমায় হাওয়া
যেদিকে চাও, যত ডাক, কেউ নেই, সব হাওয়া
শুধু আছেন এক তোমার বিপদের দিনের
ত্রাণকারী ভগবান

আর এখন বিপদের মুখ থেকে মৃত্যুর হাঁ থেকে
কানের পাশ দিয়ে গুলী বেরিয়ে যাবার মত
রক্ষা পাওয়ার শুভ মুহূর্তে
পালিয়ে যাওয়া সেই সব মুখগুলো আবার উঁকি দিচ্ছে
গুটি গুটি আবার আস্তে আস্তে এগিয়ে
আসছে।
রঙ্গমঞ্চের সেই সব চালাক জহুরীরা আর কুশীলবরা
আবার হামাগুড়ি দিয়ে
পচা নর্দমার জলের মত এগিয়ে আসছে

কিন্তু এবার একটু সাবধান!

সুনীলকুমার নন্দী

পাখির পালক

□

সারা বনভূমি জুড়ে বড় নীরবতা, পাখি
উড়ে গেছে শীতাবাসে
ফেলে রেখে কয়েকটি পালক, পালকে-মেশা
নিষ্ঠুরতা, দাহ।

আমাদেরও এত কাছে আসা-আসি, ভরাটান
সরে গেলে, তার কিছু স্মৃতি
যা-কিনা ছড়িয়ে থাকে
ইতস্তত সোফা কিম্বা খাটের বাজুতে,
ঝুঁকে আসে
একা ঘরে, নিঃসঙ্গ রক্তের বেগ
কুরে খায়, যেন ওই পাখির পালক।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পৃথক করে দাও

□

দেহ মনের মধ্যে তুমি পৃথক করে দাও,
আলো অন্ধকারের মধ্যে পৃথক করে দাও,
বেদনা সমবেদনা থেকে পৃথক করে দাও।

পৃথক করে দাও তুমি আর একত্র রেখো না,
যে কোনো ভাবে জুড়ে ও জাড়ে একত্র থেকো না,
এভাবে বেঁচে না থেকে তুমি বিদায় চেয়ে নাও।

আনন্দ বাগচী

ঠিক যাবে

□

এই যাওয়াই শেষ যাওয়া, প্রথম এবং শেষ যাওয়া।
চারদিকে চকিতে ভাঙে ঘরবাড়ি
নিসর্গের লোপাট রোদ্দুর,
জলজমা খোলা রাস্তা : ছপছপিয়ে চলেছে মানুষ
শব্দের তোরঙ্গ আর স্মৃতির হোল্ডঅল ঘাড়ে নিয়ে,
ন্যুব্জপৃষ্ঠ নিঃশব্দ মিছিলে
তার পূর্ব-পূর্বপুরুষেরা
নক্ষত্রের আলো চিনে যেভাবে গিয়েছে এই পথে।
বসবাস শেষ, ভাঙে ঘরবাড়ি লোপাট রোদ্দুরে
যেতেই যখন হবে যাও। ভয় নেই
নির্ভুল ঠিকানা লেখা খাম সঙ্গে যাবে।

Bengali Poems of Sixties

collected and edited by

Ardhendu Chakravarty

ইংরেজীতে অনূদিত এই সঙ্কলনটি
আপনার সংগ্রহশালার মর্যাদা বাড়াবে নিঃসন্দেহে।

পূর্ণেন্দু পত্রী

দুটি কবিতা

□

(১)

যে আমাকে অমরতা দেবে
সে তোমার ছাপাখানা নয়,
সে আমার সত্তার সংগ্রাম
নিজের বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়।

(২)

যেহেতু তোমার ক্রীতদাসত্বে নেই আর
অমনি ভাবলে মাথাটা কাটবে কুপিয়ে।
আমি যেন শিশু বর্গীর ভয়ে ঘুমোবো
এবং ঘুমের মধ্যে কাঁদবো ফুঁপিয়ে।

রাজা-মহারাজা যা খুশি সাজাও নিজেকে
আকাশকে টেনে নামাতেও পারো পাতালে।
আমার স্বাধীন পতাকা কিন্তু উড়বেই
সূর্যের দিকে, পা রেখে মাটির চাতালে।

কবিতাঃ ষাট-সত্তর

ষাট ও সত্তরের প্রতিনিধিমূলক কবিদের
এক মর্যাদাবান কবিতার সঙ্কলন

সম্পাদনা :
উত্তম দাশ * মৃত্যুঞ্জয় সেন * পরেশ মণ্ডল

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

দিনলিপির কয়েক টুকরো

২ মার্চ ১৯৮২

□

দিনভর আমি ভিখিরি ও বেশ্যাদের তাড়ালুম
ময়দান থেকে। দিনভর আমি গোয়েন্দাদের চিনিয়ে দিলুম,
ময়দানের কোন্ কোণে দালাল আর ছিনতাইবাজদের
আস্তানা। কারা বদলে দেয় আমাদের চশমার কাঁচ।

হঠাৎ দেখলুম, উড়ন্ত মেঘের মতো চারটে মিছিল
আসছে চারদিগন্ত থেকে। হাতে সময় ছিল না। মিছিলের
সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, আমি তড়িঘড়ি ময়দানের ঘাস
এবং অন্ধকার পরিষ্কার করে, হাজার পঞ্চাশ মেরুণরঙের
জামা বানিয়ে ফেললুম মুহূর্তের মধ্যে।

তারপর, চার মিছিলের চার নেতাকে ডেকে বললুম,
মিছিলে মিছিলে আজ আর সঙ্ঘাত নয়, আপনাদের
প্রত্যেকের জন্যে আমি মেরুণ রঙের জামা বানিয়েছি, নিন,
পরে ফেলুন। আজ কবিতা পাঠের আসর বসাব এখানে,
এবং শিল্পসংক্রান্ত আলোচনার সভা। আসুন, এবারে
আমরা একটু অন্যরকম হওয়ার চেষ্টা করি।

৩ জানুয়ারি ১৯৮৩

□

হঠাৎ একটা বাঘ আমার ঘাড়ের কাছে মুখ এনে বলল, 'হালুম।'
আমি তার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে বললুম, 'এ কী স্যার, আপনি
আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ? আমি হলুম গে আপনার আপনজন।'

বাঘটা হঠাৎ মহানুভব বড়বাবুর মতো জিভ দিয়ে আমার গা চেটে
চলে গেল।

৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪

□

একটা ছাইরঙের মানুষ আমাকে ভয় দেখাত রোজ, অন্ধকারে।
অমাবস্যায় খানিকটা জ্যোৎস্না মিশে যাওয়ার মতো—সেই রঙ
ছাড়া কিছুই দেখিনি আমি। দেখার ইচ্ছে ছিল, ভয়ও ছিল।
তখনো আমি টর্চ জ্বালাতে শিখিনি যে!

শিখলুম যখন, ঘোর অমাবস্যায় আমি আতঙ্কিত, একটা দিগভ্রান্ত
বাদুড়ের ডাক শুনে। টর্চ জ্বেলে দেখলুম, ভয়ের রঙ ছাই না,
বাদামি। ও পাড়ার মুখোস-বানিয়ে গোপালের মতো।

অবাক হয়ে আমি বললুম, 'এ কী গোপাল ? তুই আমাকে ভয়
দেখিয়ে আসছিস সেই ছেলেবেলা থেকে ?' গোপাল হঠাৎ একটা
কাকতাড়ুয়া হয়ে বলল, 'না তো! কাকতাড়ুয়ারা কাউকে ভয়
দেখায় না।'

তুলসী মুখোপাধ্যায়ের

অন্নদাস হেঁটে যায়

মর্মভেদী ভল্লের মতো এই উচ্চারণ বাংলা কবিতায়
নিতান্তই অনার্য কিন্তু অনিবার্য সংযোজন।

অনুভব কবিতা প্রকাশনী
২৪/২ আর. এন. দাস রোড
কলকাতা-৩১

অমিতাভ দাশগুপ্ত

পোড়ামুখী

□

নীল টিলা ধুয়ে ভেসেছে কাছারপাড়া
বানভাসি কাছে-দূরে
গোটা গাঁ-গঞ্জ পুরোপুরি ঠাঁইনাড়া,
পালায় উন্‌পাঁজুরে।

ফুঁ দিয়ে ফুঁ দিয়ে দুচোখ লাল করমচা
ভিজে কাঠে শুধু ধোঁয়া,
যেটুকু বেঁচেছে তা নিয়ে বরং দূরে যা—
হেঁকে ওঠে আচাভুয়া।

ঘর-ভাঙা চালে একটি কিশোরী তবু
সূর্যাস্তের মায়ায়
ভুলে গেছে পাশে বুড়ো বাপ যবুথবু—
চুল মেলে দিল হাওয়ায়।

আকাশের দিকে তুলে ধরে দুটি বোঁটা
লাজুক সূর্যমুখীর,
নিমেষে লুকোয় নিষেধের লাঠিসোঁটা—
কি হাসি পোড়ামুখীর!

অজিত মৈত্রের কবিতা

একটি গল্প

□

ছেঁড়া চাদরে মুড়ে
মা
উনুনে কাঠ ঠেলে দিচ্ছেন
কেটলিতে চায়ের জল
শীতের সকালে রোদ পিঠে নিয়ে
বাবা
মোড়ায় বসে
কাগজ পড়ছেন
পড়ছেন আর কাশছেন.....
কাশির দমকে
সত্তর বছরের দেহটা কেঁপে উঠছে
জরাজীর্ণ মাদুরে বসে
আমি
'ছাড়পত্রে'র পাতা উল্টে চলেছি.....
সদ্য চাকুরী পাওয়া ছেলে আমি
বললাম—
আপনার কাশিটা বড্ড বেড়েছে
আজ মাসের শেষ দিন
কাল মাইনে পেয়ে
চ্যবনপ্রাশ এনে দেব ঃ
মায়ের মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল!
বললাম—
মা, তোমার চাদরে আর চাদর নেই
কাল একটা চাদর কিনব।

বাবার কাশিটা থেমে যায়—
একটা নির্মল প্রশান্তি এসে
থমকে দাঁড়ায়।

এইসব সহজাত উজ্জ্বল উত্থান
প্রত্যহ সকালে
আমাকে উস্কে দেয় অনন্ত জীবনে
কিন্তু আমি চাকুরীবিহীন
সত্তর বছরের ভারে নুয়ে পড়ে
আমার বাবা
রাস্তার ধারে
পান বিড়ি তুলে দিচ্ছে
তাঁরই কোনো ছাত্রের হাতে
ছেঁড়া চাদরটা
মা
সেলাই করছেন যেন যুদ্ধ করে
শীতের রোদ্দুর তেমনি যায় আসে—
আর রোজ ভাবি
মায়ের উজ্জ্বল হাসি
বাবার নির্মল প্রশান্তি.....

এবং আমি
"ছাড়পত্রে"র পাতা তেমনি উল্টে চলেছি।

আত্মজীবনী

□

মনে হয়
আমিই এক থেকে চার হয়ে যাই :
আমার মৃতদেহটা

কাঁধে নিয়ে
ছুটে যাই
কোনো এক জাগ্রত শ্মশানে
তারপর
আগুনের আগ্রাসী ক্ষুধায়
আমার হাড়মাস
পবিত্র মশালের মতো জ্বলবে।

আমার মৃতদেহটা নিয়ে
মর্গ থেকে
আমাকে বেরুতে হবেই!

কিন্তু বড় দুঃসময়ে
মৃতদেহটা আবিষ্কার করেছি
কেননা
মরার সময়
আমার পকেটে
একটা কানাকড়িও ছিল না!

পৃথিবী

□

বাবা আমাকে
বড় হবার স্বপ্ন দিয়েছে
বাবার হাত ধরে
পৃথিবীর বিশালতা মাপি
মা আমাকে
মায়াবী মমতার
গোপন সুড়ঙ্গ দেখিয়েছে

মার বুকে মুখ রেখে
মমতার অতল খুঁজে বেড়াই.....
পৃথিবী—
আমার স্বপ্ন ও মমতার পৃথিবী
তুমিই আমার পিতা
তুমিই আমার মাতা।

স্বপ্ন ও মমতায়
আমি ঠিক
প্রকৃত মানুষের মতো পূর্ণ হয়ে আছি।

শিশির গুহের কবিতা গ্রন্থ

নিজস্ব বলে কিছু নেই

পরিবেশক :—

অনন্ত প্রকাশন

৬৬ কলেজ ষ্ট্রিট

কলকাতা

সুদীপ্ত রায়ের উপন্যাস

প্রভু, রইল

এখনো কয়েক কপি পাওয়া যাবে

রাত্নেশ্বর হাজরা

একরকম অন্ধকার

□

অন্ধকার খুব আস্তে আস্তে কথা বলে অন্ধকার
শব্দকে নরম করে ব্যাপ্ত করে
তার সহনশীলতা বাড়িয়ে দেয়
অন্ধকার
কথাকে উদার করে উদ্ধার করে

অন্ধকার জিজ্ঞাসা হয়ে ওঠে তার
উত্তরও হয়
প্রশ্ন এবং উত্তরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে অন্ধকার
তাকে
আবৃত করে অপাবৃত করে—
বীজ হয়
গাছ হয়
ফসল হয়
যৌবন এবং বার্ধক্য হয়
সবুজ এবং শুকনো পাতার নিচে শুয়ে থাকে
অন্ধকার
স্বাভাবিক এবং অপঘাত——দু'রকম মৃত্যুরই
এক নির্মাণ—

অন্ধকার আলো ধরে দাঁড়িয়ে থাকে নচিকেতাদের পথে
রহস্য এবং রহস্যহীন অস্তি এক বৈভব
নিরবয়ব এবং আকৃতিময় অন্ধকার
সরল এবং হিংস্র
এক ব্যাপকতা প্রতিদিন——

সামসুল হক

প্রিয় গন্ধ

□

চতুর্দিকে গন্ধ লাগামছাড়া
তার ভিতরে রাজার প্রিয় কোনটা
আমাকে বের করতে হবে এই
আদেশ দিলেন রাজার দাসী-দাসরা
দাসের হাতে দিনকানা এক কৃপাণ
দাসীর হাতে জাদুর মণিহার

মরীয়া হয়ে মানুষ কি-না করে
পুত্রের বুক চিরে ফেললাম আমি
দাস-দাসীরা খুশি হতেই হঠাৎ
কেন-যে এই বৃদ্ধ কুঠার হাতে
তাদের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ছিন্ন-
ভিন্ন ক'রে দিলো তাদের দেহ

হঠাৎ আমার মনে পড়লো এই
রক্তটা-ই রাজার প্রিয় গন্ধ

মঞ্জুভাষ মিত্র

সমুদ্র-ঈগলের স্বপ্ন : ভালোবাসার সঙ্গীত

□

হে সমুদ্র-ঈগল আমি পরপর সাতরাত তোমার স্বপ্ন দেখেছি
তোমার ডানার আঘাতে ফেণিল বাতাস থেকে মনে হচ্ছিল
জ্ঞান প্রেম মৈত্রীর কন্যারা একে একে উঠে আসছে,
অনেক মধ্যদিনে সূর্যের উষ্ণ রশ্মির ছোঁয়া লেগে বাতাস যখন উতলা
তখন পথ চলতে চলতে হঠাৎ মনে হয়েছে
দু বছর আগে তোমাকে দেখেছিলাম মিউজিয়ামে

কাঁচের সুদৃশ্য আধারে। দু বছর একটি রাজ্য জয়ের পক্ষে যথেষ্ট
দু বছর একটি রমণীর হৃদয় জয়ের পক্ষে যথেষ্ট
কিন্তু বিশ্বাস করো এই নির্দিষ্ট সময় মধ্যে আমি কোনো রাজ্যজয়
করিনি

জয় করি নি কোনো রমণীর হৃদয়
আগুনের মত উজ্জ্বল হৃদয় ;
অগ্নিহ্রদে চীৎকাররত গোলাপের মত শুধু ভ্রমণ করেছি

হে সমুদ্র-ঈগল তোমার স্বপ্ন আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় :
পৃথিবীতে এখনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করার মত সময় আছে
পৃথিবীতে এখনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা সফল করার পর
ঘুমোবার মত সময় আছে। আমার হৃদয় আবেগপূর্ণ এবং
ওই শোনো ভালোবাসার উচ্চ সমুদ্রতীরে
সংবেদনশীল ও করুণ লবণজলের সঙ্গীত শোনা যায়.....

উত্তম দাশ

নিজের কিছু

□

এই সব কথা রাষ্ট্র করে দিলে খুব লজ্জায় পড়ে যাই
খুব যে লজ্জার কিছু এমন নয় তবু একান্ত নিজেদের আর কি
কোন কোন কথা গোপনে বাড়ে চারিয়ে যায়
দু একটা শব্দ যখন ছিটকে বেরিয়ে আসে
যেন বেআব্রু পুরীর সমুদ্রে স্নান করছ
একটা শরীর সমুদ্র-দেখা ফিরিয়ে দেয়
খুব লজ্জার কিছু নয় যৌনতায় শরীর ভারি হয়ে ওঠে আর কি

অবশ্য সব কথাই একদিন রাষ্ট্র হয়ে যায়
তবু নিজের বলতে কিছু খুব ইচ্ছে করে।

বাদল ভট্টাচার্য

ভাবছি এখন

□

ফিরেই যাবো, নাকি
দুরন্ত এই পাহাড় থেকে হাত বাড়াবো
ভাবছি এখন।
চতুর্দিকে হলুদপাতা
পাতা ঝরছে হু-হু হাওয়ায়
বিপন্ন এক সত্তা তবু
হাতড়ে বেড়ায় গন্ধমাদন!

বুকের মধ্যে পাওয়ার কথা
অথই মেঘে নীল তারাটি
অগাধ অবুজ স্বপ্ন যত;
কথা ছিলো যত্নে ঢাকার
রক্তমুখী চিহ্নটুকু
শেষ বেলাকার সিঁদুর কৌটো।

কথা ছিলো ভুলেই যাবে
আত্মকথন আত্মহনন
দিন যাপনের কঠিন গ্লানি;
কথা ছিলো ভুলে যাবার
বেচাল যন্ত্রে বিনির্ণীত
নগ্ন হাতের নষ্টভূমি!

ফিরেই যাবো, নাকি
দুরন্ত এই পাহাড় থেকে হাত বাড়াবো
ভাবছি এখন।

নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

হলো

□

আত্মার ম্যানহোলে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ভাবছো: আবর্জনাটুকু
তুলে আনবে পাঁচ আঙুলে। কিন্তু তোমার যে নুলো হাত;
নুলো। কালের জন্তু তোমার ঘুমন্ত শরীর খুবলে নিয়ে গেছে
আঙুল! তুমি টের পাওনি! আশ্চর্য! টেরই পেলে না!

স্বভাবতঃই তাই তোমাকে তোমার ভাঙ্গা ঘরের দিকে চেয়ে
থাকতে হয়
আর দেখতে হয়—অস্তিত্ব ঘিরে কয়েকটি আঁচড়;
এ আঁচড় কি তোমার নখের
অথবা কোন জিঘাংসু জিজ্ঞাসার?

ভেবে দেখতে দোষ কি?
ভাবনা তো অন্নদাস নয় কারো—তত্ত্ব, গোষ্ঠি, দল
অথবা আত্মবিক্রয়লব্ধ অর্থের। বরং তার লৌকিক নদী
গেরুয়া জলের শাড়ি পরে ধাবিত সমভূমিতে—

কিন্তু তা তো হলোই না। হলো বলো?
ভাবনাকে অঙ্গুরীয় করে পরিয়ে দিলে প্রবঞ্চক সাপের শরীরে;
সাপ! কালোর ওপর ডোরাকাটা থুতু আর হিম আঁসের
দ্বারা গঠিত তার ষড়যান্ত্রিক দেহ

তাকে অঙ্গুরীয় দিলে! পারলে দিতে!
সত্যিই পারো তুমি! সময়টাকে লুঠ করতে পারলে;
চামড়া তুলে নিলে মাটির; আর এখন ম্যানহোলে হাত ঢুকিয়ে
ইত্যাদি।

অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর কবিতা

টার্গেট

□

কতকিছুই তো হতে পারত, নেহাৎ কম ছিল না প্রস্তুতি।
দীর্ঘ মনে পড়ে
জোসেফ স্টালিনের মৃত্যুর পর হেঁটে গেছি
ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে·····হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত
তখন সলিল চৌধুরী গাইতেন অভ্যুত্থানের গান
বহুদিন বাদে ওঁকে দেখলাম
টিভিতে চমৎকার গাইলেন
ফুলের সঙ্গে বারুদ মিলিয়ে,
একদিন সবকিছু হবে
এমন একটা স্বপ্ন এখন স্বপ্নভঙ্গের কাছে
অসহায়, সিংহাসন জুড়ে যাদের দেখছি
হৈ-হৈ আমাদের এ কোথায় নিয়ে এল !

চারদিকে এখন নিশ্চিন্তে যারা হাসছে
আসলে ওরাই তো
আমাদের টার্গেট ছিল।

বৃষ্টি নামে

□

রোজকার বাঁজা এই দ্বন্দ্বের পরেও বৃষ্টি নামে, জলোচ্ছ্বাসে
বেঁচে উঠি, ভেসে ওঠে স্নানরত মানুষের
গামছা ও সাঁতার, ভরে যায় জল, জলের নিয়ম
মনে আসে স্নেহবান বেড়ালের মুখ, সিগারেট
আগেকার ছেঁড়া ছবি :
নির্ভার গাছের নিচে যারা ছিল
গা-ঢাকা দুপুরবেলা ১৯৫০-এ।

জন

□

তিল তিল করে এ-বছরও ..
যেমন মেঘ জমেছিল ডেরি-এন-সোনে
এ-বছরও
সেই আগেকার ঠাক-ঠমক, ধুলো মাড়িয়ে
ছুটতে ছুটতে
পুরোনো মসজিদ চেপে
হা-হা হাওয়া, বৃষ্টি
পা থেকে মাথায় ; ভেসে যাচ্ছে
হাই-ড্রেন কলকতার মেট্রো রেল

কাক ভিজছে নিম-ডালের অন্ধকারে, আর
বৃষ্টির চিক্ পড়ছে কিলখানার জমানো নোংরায়
এক
দুই
তিন
অজস্র.....

আড়ালে জমা হচ্ছে
জন, গাঁ ভেঙে।

বাজি

□

পাহাড় কেটে পাথর নিয়ে যাচ্ছে রাজধানীর পেভমেন্ট।
অথচ কৈবর্ত পাড়ায় ঠিক একইরকম মেছো জাল আধপেটা মানুষ
আর ধেনো, চুল এলিয়ে
বাচ্চা মেয়ে দৌড়োয় জিপ গাড়ির চাকায়, হাইওয়ে
পেঁচিয়ে ধরেছে পুরুষের হৃদপিণ্ড ও মেয়েদের হড়হড়ে মাংস,

পোড়ো ভিটে থেকে বাদুরের চিৎকার
ভোট এলে
কাগজপত্রে তখন ভোজবাজির মেয়েমদ্দ
বুথে যায়, আঙুলে কালি পড়ে।

গোল হয়ে আমরা কলকাতায়
চৌকো টেবিল নিয়ে এখনো খেলছি
বাহান্ন তাস থেকে অনেক ক'টাই পড়ে গেছে ;
তিরিশ বছরের এই বাজি
বড় করুণ শেষ হয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যুঞ্জয় সেন

পড়ে গেলে

□

নদীতে ভেসে যাওয়া নৌকোর ছায়া পড়লে
চোখ বিকাশের আঁকা ছবির মত নিভন্ত দীর্ঘ হয়ে যায় ;
খোলা পৃথিবীতে বাতি জ্বালালে
এক বুক সাগরে মন চকি হয়ে ঘোরে

সাগরে নৌকো থাকলে খোলা পৃথিবী
দীর্ঘ হয়ে কোলাহল করে অনন্ত মুদ্রায়

আমার চোখ দীর্ঘ সুদীর্ঘ হয়ে
খোলা পৃথিবীর এপার ওপার ঘুরে বেড়ায়
দীর্ঘ ভ্রমণে আকাশ বাতাস পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকে
গাছের ছায়া নরম ঘ্রাণ হয়ে কুশলবার্তা জানায়
ধুলো ঝড়ে আমার প্রতিবন্ধী ভাব উড়িয়ে দেয় হলুদ বিকেল

আর পড়ে গেলে
আকাশ পৃথিবী নদী আমাকে ধরে তোলে

নদীতে নৌকোর ছায়া দেখে আমি দাঁড়াতে পারি

নীরদ ভট্টাচার্য

গোলাপ বাগানে

□

ভালোবাসায় অদ্বিতীয় আমার পূর্বপুরুষ
দেখো—
আগুনকে ভয় পায়
নদীর কাছে নতজানু ভিক্ষা চাইলো,
জীবন, বৈভব।
কৃষ্ণচূড়ার ফুল বুকে নদীর কণ্ঠে ফসল ফলানো গান,
প্রেমের টানে নদী সাগরে ছুটছে—আর ছুটছে—।

আমি ভালোবাসি আগুনকে,
নদীর কাছে শিখেছি বাঁচার কৌশল
আর—
সূর্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব,
আমি পূর্বপুরুষের মত নিজের ছায়া দেখে ভয় পাই না।

আমি এখন আমার গোলাপ বাগানে
আকাঙ্ক্ষিত ফুল ফোটাচ্ছি, ফুল ফুটছে।

নির্মল বসাক

এভাবেই ওঠে লোকে

□

এক পা উঠাতে পারলেই আরেক পায়ে লাথি মারতে হয়
এক পায়ে লাথি না মারলে আর এক পা ওঠানো যায় না
এ নিয়ম প্রকৃতি করেছে এ নিয়ম স্ত্রীলোকের রক্তকণিকা জানে
এ নিয়ম রজনীগন্ধার এ নিয়ম নক্ষত্র ফোটার

লোকের ঘাড়ে পা দিয়ে অথবা কাঁঠাল ভেঙে ওঠে লোকে
যেমন কুমারী আফ্রিকার নগ্নবুক পিষে কিংবা
এশিয়ার রজস্বলা যোনির জ্বালানী নিয়ে
ইয়োরোপের কৃষ্টির ল্যুভর টেমসের বিখ্যাত টানেল
মেরিকার লিবার্টি স্টাচু আর আমরা বুকের জানালা খুলে
দরজা হাঁ করে রেখে বৃষ্টিপাত বুকে নিয়ে
মরা পাতার মতো ব্যথিত মানুষ

এভাবেই লোকে ওঠে তার সোমত্ত উত্থানে
আমার বুকের পাঁজর ভেঙে যেয়ে ফুটো করে আমারই ফুসফুস

জ্যোতিরীশ চক্রবর্তী

শিকড়ের ঐকতানে

□

বজ্রের গহন থেকে বৃষ্টি এল আমার গভীরে—
আমার শিকড়গুলি উল্লসিত হয়ে মাটির ভিতরে
চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হতে চায় বিদ্যুতের মত, ভালোবেসে
বুকে চেপে ধরে সুগভীর নীড়, বজ্রের ভিতর থেকে
এমন নিবিড় এক বোধ ছড়ায় সমস্ত শরীরে।
আমার চোখ, কান, আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় ডালপালা
মেলে ধরে অখণ্ড সত্তার স্রোতে, যে সত্তা ডেকেছে
আমাকে ঐকতানে—শিকড়ে আকুল উজানে।

কৃষ্ণসাধন নন্দী

অন্নধাতু

□

উত্থান হয়েছে জানি, মানদণ্ডে ফারাক অনেক।
সাধ্য নেই তোমাকে ছুঁই।
কিছু মানুষের থাকে না অকিঞ্চনও।

আতসবাজী পোড়াও, আমি চোখ বুজে আছি
সূঁচ বেঁধালেও রক্তক্ষরণ হয় না মোটে।

আসলে ধাতুই আলাদারকম
অন্যকিছু স্বাদে ভীষণ মগ্ন আছি।

বরুণ মণ্ডল

তবু আজও

□

তখনও ছোঁয়নি মাটি সকালের রোদ
বুড়ো বাঘের মত ওত্ পেতে আছে কুয়াশা এখানে ওখানে
নদীর দর্পণে দেখি তার চলে যাওয়া;
বুকের শস্যক্ষেতে তার
প্রেম হয়ে ইচ্ছাগুলো আমার তবু আজও
খুঁটে খায় ধান

সুদীপ চক্রবর্তী

লোক লৌকিকতা

□

চেনা জানা হলে লোকের চোখে তখন ছিল
লৌকিকতা
এখন শুধু ছড়িয়ে থাকা বৃহন্নলতা
সর্ষেফুল।

হাওয়ায় ছিল পরশমণি
পাথর যেমন ভূমির উপর হামাগুড়ি
ইচ্ছে মাফিক এদিক ওদিক
ভাঙছে কিছু ভাঙুক। দেখে লোকে শেখে
প্রাচীন সব ঈর্ষাগুলি

নদীতে ভেসেছে। নদী কি শববাহী খাট।

বিজন দত্ত

সুখ এবং দুঃখ

□

একটা আপাত-সুখী জীবন ঘিরে
কিছু ক্লান্ত আত্মা—
ঘুরে ঘুরে মরে।
পাশাপাশি দুঃখের সাথে
ঘর করে অজস্র মানুষ।
বিকারগ্রস্ত সুখী জীবনের আশায়
তারাও মাঝে মাঝে হাত বাড়ায়—
ধরবে বলে।

আকাশ-কুসুম যদিও বা পাওয়া যায়
কিন্তু সুখ—
তার জন্যে হন্যে হওয়ার অসুখে
অসুস্থ কিছু মানুষ—
বিকারে ভোগে।
জানতেই পারে না দুঃখের সংগেই—
সুখ ঘোরাফেরা করে॥

তুলসী মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
দুটি দুঃসাহসী সঙ্কলন

দুই বসন্ত

এবং

গাজনের গান

এখনো কয়েক কপি সম্পাদকের ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে।
আগ্রহী পাঠক খোঁজ করতে পারেন।

গৌতম গুহ

স্বেচ্ছাগামী হুইলচেয়ার

□

আমাদের প্রয়োজন কম সংবিধান, রাষ্ট্র, বিয়ের বেনারসী, উলু
জিভে জিভ থুতুমেশা প্রেম খুকু বৌ টিপ প্রণাম—এ সবের
এসব অনর্থ নাকে কেঁদে বেড়ালীর মতো না জানিয়ে ঢুকে পড়ে
গৃহস্থ হেঁসেলে
আমাদের চাই প্রকৃত অর্থেই ৪৮ বছর অব্দি গাঁজাখুরি আয়ু
ফুটপাতে অভিশাপ উন্মাদিনীর
কোনোরকমের স্নেহচ্ছায়া অশোকতরুর চাই
সিংহ গর্জন অবশ্যই সঙ্গম বন্য স্বাধীন

ভালবাসা চাই
যাকে পাও তাকেই যাকে দেখো তাকেই লুঙ্গিপড়া প্রতিবেশী
ধারে খায় তাকেও প্রেম চাই নির্বিচারে
সালঙ্কারা প্রতিমা অব্দি ; পেঁয়াজের মতো জড়িয়ে জড়িয়ে গোল
হ'য়ে যাও
বিসর্জনের কার্ত্তিকের মতো শুঁড়িখানা থেকে যার বাবা হেলেদুলে
রাতে বাড়ি ফেরে তাকেও জড়াও—
পদ্মবনে জলের আয়না যেমন তাকায়
তেমন দেখনা কেন স্থির আমার হৃদয়ে ?
যে জীবন আছে যে জীবন নেই কাটাকুটি খেল
অন্তর খনন কর পাও কিনা দেখ
সোনার গৌরাঙ্গ

শবযাত্রা চলে যায়
অজন্তার গুহা হতে দ্রুপদীর চিত্রমালা আমার দু'পাশে ভিড় করে

আমার হৃদয় হতে উৎসারী নীলাভ প্রার্থনা না জানিয়ে চলে যায়
স্কন্ধহীন শহরের পথ ঘুরে ঘুরে

আমাদের প্রয়োজন
ভোরের ষ্টেশন ও একখুড়ি চা
কথপোকথন সরল চাষীর সাথে সন্ত্রস্ত রাজার
যেন বিস্ফোরণ চাপা পাথরে পাথরে
মাটির পাষাণ বুক তাঁতা
গোধূলির প্রান্তদেশে মোরগের ক্রুদ্ধডাক ঝুঁটিনাড়া, চৈত্র শেষে
তাবৎ জগতটাই ফাঁকা ফাঁকা রুচিমতো গৃহস্থালি কই ?
আমার দু'চোখে নক্ষত্রের বিষ ঝরে পড়ে, কানের ফোঁকরে
একঘেয়ে হায়নার ডাক
কীচকবধের কাল এ-সময় ; দু'একটা মিষ্টিকথা সেরে ফেলি অন্তরালে
ঝাল মটরের সাথে মদ 'সহেলি গো' বলে গান গাই
প্রাসাদের ইটগাঁথা অসম্পূর্ণ
তবু রাজকন্যে একান্ত জরুরী
সোনার ডিমের মতো তাজা চাঁদ নিরন্ন শিশুরা স্বপ্ন ছাখে—

আমাদের প্রয়োজন স্বেচ্ছাগামী হুইলচেয়ার
দুঃখের শনিবার থেকে যাবো অফুরন্ত সুখের বুধবারে
বুধ থেকে পিছে এসে বর্ষণমুখর সোমে থেমে যেতে পারি
বাচালের ড্রইংরুম থেকে মহুয়াতলায়
ক্রমাগত ক্রোধ ছেড়ে জ্যোৎস্নার পিক্‌নিকে

খুকু বৌ টিপ প্রণাম প্রতিবেশীদের দোরে জমা দিয়ে যাই—।

আনন্দ ঘোষ হাজরার কবিতা

গ্রামোন্নয়ন

□

ঠিক এই মুহূর্তে আমরা গ্রামের উন্নতির কথা ভাবছি
ঠিক এই মুহূর্তে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার কথা
আর স্বাবলম্বী হওয়ার কথা ভাবছি
ঠিক এই মুহূর্তে সামগ্রিক কল্যাণ আর মানবতার কথা ভাবছি
কারণ—
আর কিছুক্ষণ পরেই সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিষয়ে আমরা বক্তৃতা দেবো ;
গাড়িতে যেতে যেতে আমরা বক্তৃতার কথা ভাবছি।
আমরা কেউ কোনো কথা বলছি না
আমাদের দুজনের মধ্যে ঝুলে থাকছে অসংখ্য বাবলা ফল
আর শুকনো শিরিষ
রাস্তার ওপর গড়িয়ে যাচ্ছে থ্যাঁতলানো পলাশ
আমরা গ্রামোন্নয়নের কথা ভাবছি।

এখন আমরা বক্তৃতা দিয়ে ফিরছি ;
আজ অনেকে অনেক প্রশ্ন তুলেছে
প্রকৃত বেকার কতো আছে আমাদের জানা আছে কিনা
যথার্থ ক্ষুধার কথা আমাদের প্রকল্পের মধ্যে
সম্মান, সমীহ পেয়েছে কিনা, এইসব—
কিন্তু এখন আমরা বিশ্রামের কথা ভাবছি
এখন আমরা ক্লান্তির কথা ভাবছি
দমদমে শব্দ ক'রে একটা প্লেন নামছে দেখছি
এখন আমরা তৃপ্ত, সফলতার কথা ভাবছি ;
কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছি না
আমাদের দুজনের মধ্যে ঝুলে থাকছে নির্জনতা,
জায়মান অন্ধকার
আর গাড়ির শব্দ……

পোকা

□

নদীর বালির নীচে কিছু ক্ষুদে ক্ষুদে পোকা
পেয়ে গেছে ভিজে অন্ধকার
বালির গভীরে গিয়ে পোকাদের অনন্ত সমাজ
পেয়ে গেছে গূঢ় অন্ধকার
প্রবাহে প্রবাহে যায় রমণীয় ঢেউয়ের স্বরূপ
বোধের অগম্যস্থানে ; তীরভূমি জুড়ে
শঙ্কিত বৃক্ষের দল বজ্রপাতে বজ্রপাতে ক্ষীণ, মৃতপ্রায়
ওরা চোখ বন্ধ ক'রে গর্তের ভিতরে
শব্দ শোনে, কাঁপে কিংবা প্রকৃত মৃত্যুর দিকে যায়… ..

কিছু আর করণীয় নেই এই সত্যটুকু জেনে
এখন সম্মত প্রেমে আর কেউ থাকে নাকো জেনে
ক্রমশ নীচের দিকে যায়...
বালির গভীরে চ'লে যায়...
শব্দ শোনে, কাল গোণে, বজ্রপাত হয়...

গৌরাঙ্গ ভৌমিকের
সদ্য প্রকাশিত মরমী গ্রন্থ
ঝুলবারান্দার গল্পগুজব
বাংলা কবিতায় এক উজ্জ্বল সংযোজন

তাছাড়া
শাদা অন্ধকার, কালো অন্ধকার এবং
ঘুড়ি ও মেঘের লুকোচুরি
এখনো কয়েক কপি অবশিষ্ট আছে
সম্ভ্রান্ত দোকানে খোঁজ করুন

মৃণাল বসুচৌধুরীর কবিতা

ভেবেছিলে

□

ভেবেছিলে এভাবেই শেষ হয়ে যাবো
মাথার ওপর থেকে টুকরো আকাশ আর
পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নিলেই
নিরালম্ব ঝুলতে ঝুলতে
চিহ্নহীন চলে যাবো অতল গভীরে

ভুল

আসলে মাটির সঙ্গে কখনো তোমার কোন
সম্পর্ক ছিল না
ছিল না শব্দের সঙ্গে কোন পরিচয়
তাই ঠিক বুঝতে পারো নি
জন্মের মুহূর্ত থেকে মাটি তার সমস্ত নির্যাস
ভরে দেয় কবির শরীরে
কবি তার ইচ্ছেমতো তৈরী করে
নিজস্ব আকাশ
অসীম শূন্যতা থেকে কবিদের প্রয়োজনে
নেমে আসে দেবযান
সমস্ত নীলিমা

কবিরা মুখোশ ছেঁড়ে
অসীম করুণা নিয়ে
ঘাতকের হাতে তুলে দেয় অনুপম ফুল
পরমানন্দের নামে কোনদিন অপরের গর্দান কাটে না

ভুল

ভুল ভেবেছিলে
অনন্ত মৃত্যুর পর অদ্ভুত নিয়মে
কবিরাই বেঁচে থাকে
ঘাতকের ঘৃণ্য হাত
ভেঙে দেয় স্থির মহাকাল

জোয়ারে না ভাসে যদি

□

ধরো মিছিলের পুরোভাগে হাঁটতে হাঁটতে
হঠাৎ পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে
পথঘাট শুন্‌সান্ ফাঁকা
কেউ নেই
কোন এক বিতর্কসভায়
নিজস্ব যুক্তিতে সবে জিততে চলেছো
হঠাৎ তখনই তুমি স্বরহীন শব্দহীন

দীর্ঘ কায়ক্লেশে হেঁটে হেঁটে
পাহাড়ের চূড়ো ছুঁতে যাবে
হঠাৎ তখনই এক প্রচণ্ড তুষার ঝড়
তোমাকে নামিয়ে দিল নিচে

বিষণ্ণ একাকী তুমি পায়ে পায়ে
হয়ত বা এদিকেই এগিয়ে আসবে
খুঁজে নেবে ছায়াময় নির্জন আশ্রয়
এই ভেবে
সমস্ত জীবন
বীজ মাটি শাখা ও প্রশাখা নিয়ে ব্যস্ত আছি

জোয়ারে না ভাসে যদি
ভাটায় আটকে যায় স্মৃতি

শিশির গুহর কবিতা

জীবনের কাছে

□

পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মানুষ
তার চোখে ভাসছে দিগন্ত, শুকনো রোদ্দুর
আর রোঁয়া ওঠা শালিকের মত মাঠের খড়।
পাহাড়-সমুদ্র দেখার মত বিলাসিতা এখন নেই॥
মাটির গন্ধে আকুল হয়ে আছে তার অস্তিত্ব
ধ্যানে, মননে ক্ষুধা নিবৃত্তির আকুলতা।
চিত্রকরের রঙীন ক্যানভাসে ফসলের মাঠ।
পুষ্পিত উদ্যান, শিশুর উচ্ছলতা
যন্ত্রণাকে জ্বলন্ত করে তোলে॥
এখন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
মেরুদণ্ড সোজা করে সম্মুখে হাঁটা ভিন্ন
গত্যন্তর নেই—
কেননা আরো অনেকদূর চলার প্রতিশ্রুতিতে
সে দায়বদ্ধ জীবনের কাছে॥

দুঃখ তাই

□

এখন দুঃখ নিয়ে নাড়াচাড়া করে সুখ নেই
কোন অনুভূতি, বোধ, ভেতরে জাগে না
অথচ দুঃখ ছিল গভীর-সজীব তীক্ষ্ণতৃণ
অতি ব্যবহারে দুঃখ তাই পথের মিছিল॥
যার জন্য এতদিন ভেঙেছি প্রাচীর, কঠিন পাথর
শ্মশানে পুঁতেছি গুল্মলতা, অপার্থিব ফুলের বাগান
দু'হাতে ঝর্ণাধারা দিয়ে বলেছি—কেমন আছ?
তারা এখন রাজার শিবিকাবাহক॥

দুঃখ তাই প্রাণহীন প্লাষ্টিকের ফুল।

সুদীপ্ত রায়ের কবিতা

অথচ মানুষ

□

ঢেউ ভাঙে মাতলার নীরবতা, লঞ্চ ভাঙে মাতলার জল
ভাঙতে ভাঙতে লঞ্চ এগিয়ে যায়
এভাবে সমস্ত পদার্থই ভাঙে।
তবে ডালটন ঠিক? আইনস্টাইন ঠিক? সত্যেন বসু ঠিক?
কিন্তু এখন ইঞ্জিনের ঘড়ঘড়—আর জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ
থেমে যায় ঝড়খালির ঘাটে।
অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, পাতার মর্মর শব্দ, বাঘের গর্জনে ভাঙে
ঝড়খালি গায়ের নীরবতা।
তবু সেক্সপীয়র ঠিক? রবীন্দ্রনাথ ঠিক? গোর্কী ঠিক?
অথচ মানুষ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে।

জার্নাল—'৮৪

□

আমাদের টেবিলে কয়েকজন তুষার রায়ের ছবি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ওঁর ছবি যারা দেখেনি, তারা উৎসুক্যে টেবিলে ঘনিষ্ট হ'ল। কারো কারো চোখ চক্‌চক্ করছিল, যেন মাতলার বুকে জ্যোৎস্নার আলো। আমাদের মধ্যে একজন উত্তেজিত হয়ে কালো কফির অর্ডার দিল, এবং প্রত্যেকের হাতেই জ্বলন্ত মশাল। আমাদের নিজস্ব সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা, অপমান ভুলে গিয়ে ব্যাণ্ডমাস্টারের সেক্সাফোনে বাজে।

এতদিন টেবিলে কালো কফি আর চিনি জল খেয়ে তুষার রায় হতে চেয়েছিলাম। ফুকে পাওয়া টাকায় চিকেন স্যাণ্ডউইচ ও দুধ কফির অর্ডার পৌঁছে গেল বেয়ারার কাছে। টেবিল থেকে

চিকেনের গন্ধ উড়ে এল। অথচ, চোখ দিয়ে জল এল না।
পোলাও খেতে গিয়ে তুষার রায়ের নুন লাগে নি। ওঁর চোখের
জল নোনাজল হয়ে নেমেছিল। অথচ, চিকেন স্যাণ্ডউইচে নুন
দিতে হ'ল। সমুদ্রে সেদিন জল ছিল না
কারণ একটাই, আমি তো তুষার রায় নই।

মুকুল গুহ

সময় এবং আলোকবর্তিকা বিষয়ক কবিতা

□

আলোয় অন্ধকারে, অনেক নামের মধ্যে একটা নাম চুরি হয়ে যায়,
সেই নামের মসৃণতায় সহকার ডাল, পরিচ্ছন্নতা হস্তামলকীবৎ,
ব্যর্থ যে, এই অনুভবে তাঁরও মুকুটমালা।

পথচলতি এধারে ওধারে, অনেক দেহের মধ্যে একটা শরীর চুরি
হয়ে যায়,
সেই দেহের স্বপ্নালিঙ্গনে চোখে ছায়া ফেলে কোনারকের সুঠাম
স্তনাঙ্গীরা,
যার কোথাও কোনদিন যাওয়া নেই, তাঁর রক্তে গতি, অস্থির
সূচীবিদ্ধতা।

কত কি ভাবনার তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, একটা ভাবনা কখন চুরি হয়ে যায়,
মনের বাঘ অদৃশ্যমান সে, পায়ে পায়ে ঘোরে চারপাশে, খায়,
খেয়ে ফেলে,
দেহের বাঘের গলায় শিকল পরাতে নগ্ন শরীরই পর্যাপ্ত, কিন্তু মন,
হায় মন।

দেহের বাঘ খায় না, খায় মনের বাঘ, যার অন্য নাম ভয়।

অজিত বাইরী

কেন জাগাও

□

ভুবনমোহন, কেন আমাকে জাগাও
মাঝরাতে? কেন ঘুম থেকে তুলে
মুখোমুখি করাও এমন কঠিন প্রশ্নের?
নিহত সন্তানের মুখ কেন সেদিন
সনাক্ত করতে ভয় পেয়েছিলাম? কেন
থানাগারদে বন্ধুর মুখোমুখি হ'তে সাহসী হইনি?
কেন অবিশ্বাস করেছিলাম তোমাকে?
কেন ভাড়াটে গুণ্ডাদের ট্রলিতে চড়ে
বাজার মোড় পেরিয়ে গেলে
তোমার রক্তাক্ত লাশ,
স্বস্তিতে শ্বাস ফেলেছিলাম?

কেন—কেন—কেন হাজারটা কেন
হিংস্র একপাল নেকড়ের মতো
আমাকে তাড়া করে, আমাকে টুকরো টুকরো
করে দাঁতে ছেঁড়ে।
মাথার নিচে বালিশ নয়, আঁচের জ্বলন্ত ইট;
পিঠের নিচে পেরেক, শুধু পেরেক!

ঘুম নয়, ঘুমের মতো আচ্ছন্নতায়
যেটুকু শান্তি পাই, কেন ছিনিয়ে নিতে চাও?
কেন মুখোমুখি করাও
মৃত্যু-যন্ত্রণার অধিক মর্ম-ছেঁড়া কঠিন প্রশ্নের?

মনোজ নন্দী

সভ্যতার নীল হাফ্-শার্ট

□

অজস্র ব্যর্থতা আছে আমাদের—যেরকম সকলেরই থাকে
অজস্র টুকরো-টাকরা পরাজয়বোধ, ছোটোখাটো চিড় ; খুব
গভীর গোপন।
যেরকম ইঁদারার পাশে পড়ে থাকে বেওয়ারিশ লাশ ; সনাক্তবিহীন,
জারুল গাছের নীচে অবেলায় যেরকম বিপন্ন ভিখিরি খড়কুটো
জড়ো ক'রে জ্বালায় আগুন—

অথবা সুবর্ণ সুযোগ বুঝে ঝাঁপ দেয় অরণ্যের বাঘ—হিংস্র আদিম ;
যুবতীর স্বপ্নের ভেতর খুব দ্রুত ঢুকে পড়ে বিষময় কৃষ্ণসাপ—রক্তে
মেশে তার বিষের ছোবল। আর এভাবেই একদিন আমাদের
জুলপির রঙ শাদা হয়ে আসে—শিশুর ঠোঁটের থেকে মুছে যায়
নৈসর্গিক প্রীতি। নাকি বয়সের জীবনসর্বস্ব কাটাকুটি খেলা
আমাদের ক্লান্ত ক'রে ? চূর্ণ বিচূর্ণ করে খুব ?

আহা ! তবু দর্পিত যৌবন একদিন ঘনিষ্ঠ ট্রিগারে হাত রেখেছিল ;
ভুল নিশানার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল আদর্শ কার্তুজ—কী ভীষণ
ভ্রমে।

তাই আজ বসন্ত-উৎসব রাতে বিনষ্ট এসরাজ বাজায় এখন কিছু
অনুগত খোজা আর অসভ্য কেরাণী। সভ্যতার নীল হাফ্-শার্ট
গায়ে কবি ও ভিখিরি খুব পাশাপাশি হাঁটে ..

আমাদের একতিলও লজ্জা করে না।

শ্যামলকৃষ্ণ বসু

মনন-বন্দরে

□

মনন নামা বন্দর
তার পশ্চাদভূমি মন—
জারুল শিমূল শাল সেগুন আর বুনো ঘাসের ঝোপ,
তাল তমালের সারি, জলা, কাঁটাগাছের স্তূপ,
অম্লকষায় নাম-না-জানা ফল,
চেনা অচেনা অনেক ফুলের ঝাড়,
পশুপাখী অনেক নবীন প্রবীণ সরীসৃপ।

এসব কিছুর সওদা আর উদ্ভট বিপণনে
বিশৃংখল সে বন্দরের দশা।

একদিনের এক হঠাৎ এলো ঝড়ে
বুকভরা আশ্বাসে এই শ্রান্ত চোখে পড়ে—
সে বন্দরের জলের পশ্চিমসীমায়,
পাগল ঢেউএর বিহ্বল হিন্দোলে।
গভীর বিচার—গহন বোধির শেষহীন
মাস্তুলে
আটকে আছে নিটোল চাঁপার
সুস্মিত আনন্দ।

মনন নামা বন্দর .....

রাখালরাজ মুখোপাধ্যায়

তাজমহলে বসে

□

শ্বেত পাথরের বুকে কে গুঁজেছে কান্না ?
পর্যটক জানে না। জ্যোৎস্নার ঠোঁট তাই বাঁদিকে ভেসে
সাজাহান-মমতাজ তো নিছক দুটি মানব ও মানবী
প্রখর বাতাস স্বাদ নেয় বহু যত্নে জমানো কষ্ট চেটে-পুটে।

ইতিহাস শুনছে কান পেতে, অনন্ত বঞ্চনার কথা
কয়েকশ' বছর আগে আপন করে পাবার যে প্রথা ছিল
দুরন্ধর সে রাজার খেয়াল উবে গেছে কবে।
এখনো যমুনা বয়ে যাচ্ছে বিরহের নোনা জল ধুয়ে
হয়তো লাল লবণ শিশিরে শিকার দূরে রেখে মহাভান
কিম্বা হয়তো পাষাণ সে জলের নীচে আজও চুপচাপ।

মনে পড়ে, একদিন যৌবন এসে মৃত্যুশেষে কাঁদিয়েছে
সৌজন্য জানাতে এসে বলি দেবতার দেউল
সারাদিন সারারাত কেঁদে গেছে কিছু শিল্পী
তারপর বহু জল যমুনা নিয়ে গেছে
পুরুষের পাশে শুয়ে একটি নারীর কফিন : আজ এই
সমগ্র ইতিহাস উল্টে আজ তারা বড় সুখে নিদ্রা যায়।

জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়

নির্বাণলাভের উপায়সমূহ—১

□

একজন দুঃখিত মানুষকে নিয়ে এভাবে ঠাট্টা করতে নেই।

তোমার ঋতুমতী মাঠ হা হা ঝলসায় রোদ্দুরে
বেনোজলে বাস্তুসাপ—
শ্রম দেবে শ্রম দেবে বলে তুমি চৌরাস্তায়
শরীর দেখাও, আর তোমার ভাঙ্গাচোরা চোখে অরণ্য শব্দ
আমি তো শুনেছি
আমি তো দেখেছি সব মার্জিত অলিন্দ থেকে
প্রতিবন্ধী-কেদারায় বসে। দুঃখ বড়ো
ভালো লাগে, কেমন উদাসী
কান্না পায়। অথচ তোমরা
একজন দুঃখিত মানুষকে নিয়ে
এভাবে—

কমলা বসু সম্পাদিত

সারাবেলা

পত্রিকাটি পড়ুন এবং পড়ান

কলকাতা - ৫০

প্রবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা

দাবী সনদ

□

তিলোত্তমার ভি. আই. পি. স্পটে
হোর্ডিং দিয়েছি : পূজায় চাই
খুচরো পয়সা,
যথেষ্ট বিদ্যুৎ,
পয়ঃ প্রণালীর সংস্কার
এবং পানীয় জল—

পূজায় চাই :
নতুন শ্লোগান,
নতুন মিছিল,
নব-জাতক
এবং পরিশ্রমের ফল—

পূজায় চাই :
বোনাস, এক্সগ্রাসিয়া,
লক-আউট প্রত্যাহার
নতুন নিয়োগ
এবং ষড়যন্ত্র বিফল—

পূজায় চাই :
নতুন বেদী,
নতুন মন্ত্র
নতুন চেতনা
এবং নিয়ম-শৃংখল !!

হোর্ডিংটাকে তিলোত্তমার
বিউটি স্পট মনে হচ্ছে এখন।

শহুরে শরৎ

□

দুঃস্বপ্নের নগরীর হতাশাকে
উপেক্ষা করে,
দূষিত শহুরে বাতাসকে
বিদ্রুপ করে—
ময়দানে কাশফুল হাসছে......

বোনাস, এক্সগ্রাসিয়ার
সোচ্চার দাবীকে
বরাভয় দিয়ে,
বেকার-হকারকে
আশার আলো দিয়ে
মহানগরীর ধূসর আকাশে
শরতের চাঁদ ঐ ভাসছে।

পপ্-ডিসকো আর
ঢাকের কাঠির বোলে
এখন আগমনীর
যুগল-বন্দী
ঈথার মাধ্যমে ভাসছে।

আত্মজনের আপ্যায়নে

অজিতের শোনপাপড়ি
আগুরীপাড়া, কাঁচরাপাড়া
২৪ পরগণা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কায়াতরুবর

□

শরীর বৃক্ষে পাঁচখানি ডাল
মন চঞ্চল, ঢুকে আছে কাল।
পাও যাতে মহাসুখ ঠিক বুঝে
লুই বলে, নাও সদ্‌গুরু খুঁজে।
সুখ-দুঃখের সংসারে যবে
মৃত্যুই ধ্রুব, সমাধি কী হবে?
কপাটে ছন্দবন্ধন থুয়ে
থাক শূন্যের পাখা পাশ ছুঁয়ে।
লুই বলে, ধ্যানে পাই দর্শন
পেতে দুই পিঁড়ি ধমন চমন॥

● চর্যার পদানুসরণে

চর্যাপদের অনুবাদ—কিংবা ঠিক অনুবাদ নয়—চর্যাপদের অনুসরণে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ চর্যাপদ বেরুচ্ছে অনতিবিলম্বে।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

একজন মহিলা কবির উদ্দেশ্যে

□

এই নিয়ে পাঁচদিন পথে যেতে যেতে দেখা হোল।
আমি ঠিক আপনাকে খুঁজি না
আমি চশমাছাড়া হাঁটি, তবু
একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেলে উভয়েই সৌজন্যে কাতর।

কেমন আছেন? ভালো। এইমাত্র কথা
বাকি সব কথা তো খাতায়।
আপনি হয়তো বেছে বেছে শিম
কবিতা লেখার হাতে তুলছিলেন, দুধের ডিপোর দিকে
থেমে থেমে
দুধ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে ভাবতে যাচ্ছিলেন একা
আমি সে চলন্ত ধ্যান ভেঙে দিই
আপনাকে আড়ষ্ট হয়ে কুঁকড়ে যেতে দেখে কষ্ট পাই।
আমার পোশাক একটু বিসদৃশ
আপনিও কিঞ্চিৎ আলুথালু
চতুর্দিকে শব্দ আর মাছির ভনভন
গতানুগতিক নিচু জীবনের গন্ধ—আমি জানি
চোখ বুজে কোনোক্রমে অতিক্রম করেন কবিরা।

আমি বেরসিক, তবু না থেমে পারি না
কেমন আছেন? ভালো? বলতে গিয়ে বারবার
আপনাকেই ক্লিষ্ট হতে দেখি।

প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর কবিতা

গাছের গুঁড়ির গায়ে

□

কোথাও রৌদ্র যেন চুঁয়ে পড়ে লতাগুল্মময় এই বনের ভেতরে।
আলো যে ছায়ার সঙ্গে মিলে যায়, নাচায় যে হাওয়া শুধু একরাশ
পাতা তা আগে কখনো ঠিক এইভাবে নজরে আসে নি। যেন সব
চেনাচেনি ছাড়িয়ে, এখন অন্যরকম এক পরিচয় শুরু হ'য়ে গেছে।
কে এনেছে এই আলো-অন্ধকারে-ভরা গাছে গাছে অদ্ভুত শিহর।
কিরকম ঘর এই বনের ভেতরে আছে? কার আছে কে আসে
এখানে? মাঝে মাঝে অনুমানে সব কিছু বুঝে নিতে হয়, বোঝা
যায়। এতোদিন গাঢ় অন্ধকার ছিলো, ছিলো ডাল থেকে ডালে
বাদুড়ের ব্যস্ত ওড়াওড়ি। এখন কিছুটা আলো, কিছুটা আঁধার।
গাছের গুঁড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে বসি।

কারা কড়া নাড়ে

□

এখন অন্ধকারে কড়া নাড়ে কারা? দেবো কি দেবো না সাড়া,
ভাবতে ভাবতে বেলা যায়। যা নাচায় হাওয়া ঐ কিছুটা বাইরে,
তা কি শুধু শুকনো পাতা, একরাশ ধুলো? কিছুই তেমনভাবে
বোঝা যায় না, শুধু মাঝেমাঝে তীক্ষ্ণ শব্দ শুনে জেগে উঠি। মনে
হয়, ওরা যেন কিছু একটা আমাকে জানাতে চায়। নাকি তা-ও
নয়? শুধু কড়া, নেড়ে নেড়ে, তারপর কিছুই বলে না। তবে কেন
শব্দ করে? এ-শহরে দীর্ঘদিন আছি। কানামাছি খেলবার
ফাঁকে, কখন যে ঘরের ভেতরে এসে ব'য়ে গেছি, তা ঠিক মনেও
পড়ে না। তবু কি সমস্ত কিছু চেনা মনে হয়? আয়নায় চকিতে
কিসের যেন ছায়া এসে, দূরে চ'লে যায়। হয়তো এভাবে বাঁচা
ঠিক নয়, হয়তো আরেকটু পরে ঘরে ফেরবার কথা ছিলো। কড়া
নাড়ে, কড়া নাড়ে কারা? আমি কি আবার গিয়ে দরজা
খুলে দেবো?

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

বিস্ময়

□

তোমার দুঃখের সাদা আমার শব্দকে ঘিরে ধরে
কালো আলোচনায় সুরু হয় আকাশের
সূর্য-সন্নিপাত, নক্ষত্রও অবাক বেড়াতে চলে আসে।
এখন সময় নয় তোমাকে লেখার, দ্বিধাহীন
মাধবীগন্ধের পাশে জয়ী খোঁপা খোলা এলোচুল
উপমাহারাণো চোখ প্রণয়ের নেশায় কাতর—আমি
দেখেও এখন আর বসাবোনা নতুন অক্ষর,
তোমার দুঃখের সীমা, হাতদুটি আলিঙ্গন হয়ে উঠলেই বোঝা যাবে
তন্ন খোঁজা প্রেমের প্রথম তাপ কোন মাংসে
দুর্বার দ্রবণে যাবে গলে, দুঃখকে সরাবে
আমার নিজস্ব সাদা ব্যক্তি-ব্যাপকতা, অধিকার ভেবে
পাহাড়ের শীর্ষ শিখে যে সলিল মানুষকে চিনতে নেমে আসে
সমুদ্রের তীরে তীরে যতবার জলের গম্বুজ ভাঙে, বালি নড়ে ওঠে
আমি তাও একদিন অধিকার করেছিলাম, অথচ
এখন গাছপালায় আর সেরকম ঋতুচিহ্ন ফুটছে না, আমাকে
দেয়াল ভাঙতে হয়, সাদা পাহারার পাশে
যে-সব কাঠ ইট, জানালার লোহা ও মরিচা
তাদের সরিয়ে চলে যাই ঐ আকাশ নামক
বিপুল গ্রন্থের নিচে, ওপরে তাকিয়ে দেখি যাবতীয়
সুরু ও সমাপ্তি ঐ পরার্ধ বিশাল নীলে
স্থায়ী মিশে আছে।
আমার নিজস্ব সাদা, আমার আক্ষরিক সূচনা
সব ঐ আলোর উৎসাহে নিভে যায়।

ঘরে একমাত্র তুমিই লেখাও, সিঁথিতে কঙ্কণে আর্দ্র-অন্ধকারে
তোমার মানবী অধিকার
আমাকে একাকী নিয়ে মেতে ওঠে শব্দের সমান কোনো কালো
আলোচনায়
সাদা পাতায় তাকে কবিতারও বড় কোনো ঐহিক বিস্ময় মনে হয়।

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

দিওতিমার প্রতি

□

তোমাকে খুঁজেছি আমি দ্রাক্ষাবনে
নাসপাতিগুচ্ছের হলদে আলো
দেখে ছুটে গেছি
মসমাখা সবুজ পাথর
পার হয়ে গেছি সন্তর্পনে
যেখানে যায় না মানুষেরা

কপাট ভেজানো
আশেপাশে
তোমারই থাকার কথা ছিল, দিওতিমা
কে তোমাকে তবে চোখের আড়ালে রেখে
খেলা করে
নিজে তুমি
অশুভ বাতাস ?

আমার আঙুল কেঁপে যায়

FOR HIRE AND REPAIR OF ALL TYPES OF MOTOR VEHICLES

PLEASE ASK

BHAGYA LAXMI MOTOR WORKS

264, ACHARYA PRAFULLA CHANDRA ROAD
CALCUTTA-700 006

Phone : 35-8834

সুরজিৎ ঘোষ

ছবির মতো

□

যতবার দরজা খুলেছে হাওয়ায়
অস্পষ্ট সুর উপচে পড়ছে
বধির দেয়ালে বন্ধ্যা ঘরে
চৌকাঠে দাওয়ায়।
সুরের দোলায় একটা নৌকো
উঠছে আর নামছে
থৈ থৈ পদ্মপুকুরে
বেঁটে, রোগা, চৌকো
হরেকরকম ছবি কাঁপছে।

একসময় কিছুই থাকে না।
হাওয়া বয় না, ঢেউ ওঠে না সুরের,
শুধু কাছে এবং দূরে
স্মৃতির পর্দা জুড়ে
শব্দ হয় ঝমরঝম—
যেন পড়ন্ত দুপুরে
এক-গা সোনার গয়না নিয়ে
নতুন বউ হেঁটে বেড়াচ্ছে ;
দরদালানের ফাঁক দিয়ে
আলো ঝলসাচ্ছে মাঝে মাঝে
কোথাও একটু বেশি, কোথাও খুব কম।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

ফোটোগ্রাফী : ১৯৮৪

□

আগেরবার
যখন হেলিকপ্টারে
দৃশ্য দেখতে গিয়েছিলেন—
সঙ্গে রঙীন ফিল্ম্ ছিল না—
কি জলের, কি জল থেকে আধজাগা নাঙ্গা হাতের ছবি
বড্ডো কালো দেখিয়েছিল—

এবারে সঙ্গে রঙীন ফিল্ম্
রুশী চীনী মার্কিনী—
এবারে হেলিকপ্টারে চড়ার আগে
নিয়ে যেতে নিশ্চয়ই ভুল হবে না—

অলিম্পিকের আগে
হাত পাকাবার কী দারুণ সুযোগ।

জহর সেন মজুমদার

আমরা

□

ঘরের মধ্যে আছে স্মৃতি, নেই কোনো লুপ্ত সভ্যতা।
আছে সূর্যদেশীয় পাখির উত্তাপ, আছে রহস্য,
আর বেঁচে আছি আমরা মানুষ, যারা ঠোঁট দিয়ে
ছুঁই মেঘ চোখ দিয়ে ছুঁই রাত পা দিয়ে ছুঁই
ভূমি। আমাদের দিকে ফিরে প্রাচীন নক্ষত্রেরা
খোঁজে রক্তঅলংকার। আর চারিদিক থেকে
ভেসে আসে আর্যশতাব্দীর মুক্তপুরুষের গান।
আমরা আজ থেকে কাঁদবো না, আর কাঁদবো না—

তুলসী মুখোপাধ্যায়

পরাজিত হেঁটে গেলে

□

পরাজিত হেঁটে গেলে টের পায় পথের কুকুর
তার মড়া দেহে জড়ো হয় উপোসী শকুন
তার পচা গন্ধে ছুটে আসে মাংসভোজী মাছি
পরাজিত হেঁটে গেলে টের পায় পথের কুকুর।

পরাজয় বড় অপরাধ—বড় দুঃসহ কঠিন করাত
তার ভূত নাই, বর্তমান নাই, ভবিষ্যৎ কুচ্ছিত কাছিম
তার জ্যোৎস্নায় বিমোহিনী চাঁদ তারা নাই
তার ফুলের বাগানে পরী বেড়াতে আসে না
তার দিন যায় মরুগ্রাসী জ্বলন্ত আঁধারে
তার রাত কাটে তুলকালাম পেত্নীর বাজারে

With Best Wishes From :

Annapurna Card Board & Printers

Office : 67/B, S. N. Banerjee Road
Factory : 7 & 9, Durgacharan Doctor Road

Speciallst in manufacturing
Ice Cream Cups, Water glass etc.

Phone No : Office : 24-4786
Resi : 24-5072

Anubhab Kabita Patra • Autumn 1984 • Rs. 4

ভালো মানুষ চাই

তুলসী মুখোপাধ্যায়

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়ে আছে

"ভালোমানুষ" প্রকাশক পেলেই বেরিয়ে যাবে

তুলসী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও ২৪/২, আর. এন. দাস রোড, কলকাতা-৩১ থেকে প্রকাশিত। তরুণ প্রিন্টার্স, ২৯, কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রিত।